জল তরঙ্গের হাসি

প্রকাশনায় ও প্রচারে
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
গাংনী, মেহেরপুর

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

জল তরঙ্গের হাসি

প্রকাশনায় ও প্রচারে
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
গাংনী, মেহেরপুর

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

ডিজাইন ও প্রোডাকশন
Visual Acoustics
Visualize Your Thinking.......
Cell: +88-01676974888, visualacousticsbd@gmail.com

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৯

প্রকাশনায়
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বাঁশবাড়ীয়া, গাংনী, মেহেরপুর
ফোনঃ +৮৮-০৭৯২২-৭৫০৪৬
ই-মেইলঃ psksmeherpur@gmail.com
info@psks-gm.org
ওয়েবসাইট ঃ www.psks-gm.org

প্রকাশনা উপদেশক
জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩, পিকেএসএফ
ড. শরীফ আহম্মেদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

সম্পাদনা পরিষদ
এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
মেহেদী হাসান ওসমান, সহকারী ব্যবস্থাপক (মৎস্য), পিকেএসএফ

সহযোগিতায়
মোঃ মোজাম্মেল হক, মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
এম. এ. জি মোস্তফা রাব্বী, কৃষি কর্মকর্তা, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
ডাঃ কে এম মেহেদী হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুহঃ মোশাররফ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
মোঃ কামরুল আলম, কর্মসূচী সমন্বয়কারী-১, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
মোহাঃ কামরুজ্জামান, কর্মসূচী সমন্বয়কারী-২, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

মুহঃ মোশাররফ হোসেন
নির্বাহী পরিচালক

প্রাক্কথন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় প্রকাশনাটি প্রণয়ন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে ১৯৭০ সাল হতে খুলনা বিভাগের বিশেষ করে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ জেলার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যথা- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, আইন ও মানবাধিকার, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন, ও ঋণ সহায়তাসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থা বিগত ১৯৯৫ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। এই দীর্ঘ পথ চলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) সব সময় পিএসকেএস-এর পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শ এবং আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

"নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে"

২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ১টি শাখার মাধ্যমে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে সংস্থা মোট ৪টি শাখার মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংস্থার কর্মএলাকায় নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। বিশেষ করে মাছ চাষ, পুকুর পাড়ে সবজি উৎপাদন, টার্কি পালন, ফেরোমন ফাঁদ কর্মএলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কর্মএলাকায় প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ফলাফল দেখে অন্যান্য কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তি সমূহের ব্যাপকভাবে প্রতিরুপায়ন ঘটেছে এবং কর্মএলাকার জনগণের মাঝে সাড়া পড়েছে যা ইউনিট দুটির বিশেষ অর্জন।

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় এই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আমি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি এই প্রকাশনা প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃষি ইউনিট

পৃষ্ঠা ঃ ০৮-১৯

জীবন সংগ্রামে আত্মপ্রত্যয়ী

শরিফা খাতুন

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের এক সংগ্রামী নারী শরিফা। বয়স ৫৫ বছর। ৬০ বছর বয়সী স্বামী জেকের আলী ২০১৭ সালের শেষের দিকে বিদেশ যায়। বর্তমানে সৌদিতে থাকে। দুই মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। সবাই স্বামীর বাড়ীতে থাকে। স্বামী বিদেশ যাওয়ার সময় প্রায় ৩.০ লক্ষ টাকা ঋণ করে সৌদিতে যায়। পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে বিদেশ যাওয়ার সময় স্বামী ২০,০০০/- ঋণ নেয়। যার পরিশোধের দায়িত্ব পড়ে শরিফার উপর। কি করবে ভেবে পায় না। কারণ মাঠে যে জমি আছে তা বন্দক রেখে বিদেশে গিয়েছে স্বামী জেকের আলী। কি খাবে, আর কিভাবে কিস্তি পরিশোধ করবে। স্বামী বিদেশে যে বেতন পায় তা ঋণ পরিশোধ করতে শেষ হয়ে যায়। এসব ভাবতেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠে শরীফা।

শরীফা সমিতিতে এসে জানতে পারে যে, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি কৃষিকাজ বিষয়ে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করে। তখন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির টেকনিক্যাল অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ করার ফলে ২০১৭-২০১৮ সালে বসতবাড়ীতে সারাবছর সবজি এবং ফলমূল চাষ এর আওতায় একটি প্রদর্শনী গ্রহণ করে শরীফা। শরিফা মনেপ্রাণে একজন গৃহিণী হলেও অন্য সব গৃহিণীর চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। কারণ তাকে বাজার সহ অন্যান্য কার্যক্রম একা করতে হয়। শরীফার বসতবাড়ীর পাশে পতিত জায়গা আছে কিন্তু কখনও বাণিজ্যিকভাবে সবজি ও ফলমূল চাষের কথা ভাবেনি। প্রায় ৩০ শতাংশ জায়গার মধ্যে ৪ শতাংশ জায়গায় বাড়ী। অবশিষ্ট জায়গা পতিত পড়ে থাকায় এই পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করার পরিকল্পনা করে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর বাড়ীর আশেপাশে প্রায় ১১-১২ প্রকারের সবজি চাষ করেন শরীফা। প্রথম বার নিজের খাওয়ার পরেও প্রায় ৬,০০০/- টাকার সবজি বিক্রি করেন। এভাবে প্রতিনিয়ত সবজি চাষ করছেন এবং প্রতি মাসে কিছু না কিছু সবজি বিক্রি করছেন। এতে পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গড়ে মাসিক প্রায় ২০০০-২৫০০/- টাকার সবজি বিক্রি করছেন। বর্তমানে সমিতির কিস্তির টাকা সবজি বিক্রি করে প্রদান করছেন। একজন পরিশ্রমী নারী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেছেন বাড়ীর আশেপাশের প্রতিবেশিদের মাঝে। প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও শরিফার সংসারে এখন স্বস্তি আছে। অনেকের কাছেই শরিফা এখন সাফল্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

একজন আত্মবিশ্বাসী হাফিজুরের সফলতার কাহিনী

গাছে ফল, মাঠে সবজি এই নিয়ে মেহেপুরের গাংনী উপজেলা। গ্রামের পর গ্রাম চোখে পড়বে বিভিন্ন রকম সবজি এবং ফলবাগান। এখানকার এমন কোনো বাড়ি নেই, যার চার পাশের পতিত জায়গায় কোনো সবজি কিংবা ফলের চাষ করা হয়নি। তেমনি একটা গ্রামের নাম সাহারবাটি। শুধু মেহেরপুর জেলা নয়, দেশের বিভিন্ন জেলায় এখানকার সবজি এবং ফলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বহু কৃষক ফল চাষ করে স্বনির্ভর হয়েছেন। এমন সবজি ও ফল বিপননের পেছনে এই এলাকার পরিশ্রমী ও আগ্রহী চাষিদের অবদান রয়েছে। তারা নিজেরা হয়েছেন সফল, অন্য দিকে তৈরি করেছেন আরো অনেক সফল চাষি। তারই এক উজ্জল দৃষ্টান্ত মোঃ হাফিজুর রহমান। সৌদি আরবে থাকতেন। আর মন পড়ে থাকত দেশের মাটি ও মানুষের কাছে। কারণ বাবা ছিলেন কৃষক। বাবার কাছেই ছোটবেলায় কৃষিতে হাতেখড়ি হাফিজুরের। বিদেশ থাকার সময় কিছু টাকা সঞ্চয় করে নিজ গ্রামে ২ বিঘা জমি ক্রয় করেন হাফিজুর। আর বিদেশ থেকে ভাবতে থাকেন জমিতে কি চাষ করা যায়। কোন একদিন জানতে পারেন এলাকার একটি প্রতিষ্ঠান ‘পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’ কৃষকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কারিগরি সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ও উচ্চ ফলনশীল ফল বাগান (অরচার্ড ব্যবস্থাপনা) প্রদর্শনীর আওতায় সহযোগিতা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অরচার্ড এর আওতায় ৩০,০০০/- টাকার ৪০০টি মাল্টার চারা ২ বিঘায় আগষ্ট/১৮ মাসে রোপণ করেন। লাগানোর ১০ মাসের মাথায় কিছু গাছে ফল আসে। এক সময় ফল পাকে। ফল এর স্বাদ বিদেশী মাল্টার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ যাবত প্রায় ৪০০টি ফল আহরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মাল্টা মিষ্টি হওয়ার কারনে আরও ১ বিঘায় মাল্টা চাষ করার জন্য জমি লিজ নিয়েছে হাফিজুর। বাগানে মাল্টা আছে প্রায় ২.০ লক্ষ টাকার। কৃষক হাফিজুর এর সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক ও তার সমবয়সীরা মাল্টা চাষ করার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক কৃষক হাফিজুর-এর সাফল্য দেখার জন্য আসছেন এবং পরামর্শ নিতেছেন। কারণ তিনিই প্রথম সফলভাবে মেহেরপুরে মাল্টা চাষ করেছেন।

আজিরন নেসার

সাফল্যের গল্প

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের এক সংগ্রামী নারী আজিরন। স্বামী, এক ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে সংসার। বড় ছেলের বয়স ২২ বছর, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। মেয়ের বয়স ১৭ বছর। কলেজে পড়াশোনা করছে। স্বামী দিনমজুর। নিজের কোন জমি নেই। পুরোটা দিনমজুর স্বামীর আয়ের উপর চলে। এমতাবস্থায়, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি আজিরনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এরই প্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ইউনিটের আওতায় আজিরনকে ট্রাইকো-কম্পোষ্ট প্রদর্শনী বাস্তবায়নের একটি হাউজ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এলাকাটি সবজি এবং মরিচ চাষে ব্যাপক পরিচিত। মরিচ চাষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল গোড়া পচে যাওয়া। সবজি চাষে কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকেন। তাই সাহারবাটি গ্রামে কৃষি ইউনিটের আওতায় পলাশীপাড়া আজিরনকে ট্রাইকো-কম্পোষ্ট হাউজ স্থাপনের জন্য নির্বাচন করে। পাশাপাশি ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সারকে এলাকাতে পরিচিত করে দেওয়া হচ্ছে। এর আলোকে বর্তমানে প্রতি ৪০-৪৫ দিন পর পর ১৫০-১৬০ কেজি সার সংগ্রহ করছে আজিরন। যা আশপাশের লোকজন ক্রয় করে জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করছে। বর্তমানে প্রতি কেজি সার ১০ টাকা করে বিক্রি করছে আজিরন। ফলে প্রতি দেড় মাসে ১৫০০-১৬০০ টাকা আয় করছে, যা দিয়ে পরিবারে সামান্য সহযোগিতা করার পাশাপাশি মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছেন। বর্তমানে আজিরন নেসার ট্রাইকো-কম্পোষ্ট দেখে অন্যরাও আগ্রহ প্রকাশ করছেন ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের এবং অনেক সদস্য ইতোমধ্যে শুরু করেছেন এই সার উৎপাদন।

ফেরোমোন ফাঁদে বাজিমাত

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কৃষি ইউনিট-এর আওতায় বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০ টি ফেরোমোন ফাঁদ এর প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ কর্তৃক পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতিকে বাজেট বরাদ্দ করা হয়। গাংনী উপজেলা বরাবরই সবজি চাষের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে ট্রাক ভরে ভরে সবজি যায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে। এ এলাকার কৃষক যেন কম পরিমাণে কীটনাশক সবজি চাষে ব্যবহার করে সেজন্য তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায়, কর্মসূচির শুরুর দিকে কৃষকদেরকে ফুলকপির মাঠে যখন জাদুর ফাঁদ স্থাপন করার কথা বলা হয় তখন কৃষকরা প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তারা সাদরে গ্রহণ করেছেন। এর বাস্তব ফল পাওয়ায় এখন এই এলাকার অধিকাংশ কৃষক বিষমুক্ত ফুলকপি, কুমড়া, করলা উৎপাদনের জন্য ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এর আলোকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে ৭ টি প্রদর্শনীর আওতায় ক্লাষ্টার হিসেবে প্রায় ৪৭ জন কৃষককে এবং ১৪০ বিঘা ফুলকপি (প্রায় ১-১.৫ কিমি এলাকা) জমিতে ফেরোমোন ফাঁদ স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ফুলকপির লেদা পোকার জন্য কোন প্রকার বিষ ব্যবহার না করে ফুলকপি উৎপাদন করছে এই এলাকার কৃষকরা। ইতোমধ্যে এলাকাটি বিষমুক্ত ফুলকপি উৎপাদনের এলাকা হিসেবে পরিচিত লাভ করছে।

আগাম কর্মএলাকায় শীতকালীন ফুলকপি চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা হল লেদা পোকা। এই লেদা পোকার আক্রমণে মাঠের পর মাঠ ফুলকপি নষ্ট হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় কীটনাশক প্রয়োগের পরও এই পোকা মরছে না। তখন আর কৃষকের করার কিছু থাকে না। আবার কীটনাশক প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বাজারে বিক্রি করার জন্য। কিন্তু এটি শুধু হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষিত কৃষকই জানে। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত, সঠিক তথ্য না জানার কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার পরই পোকা মারা গেলে মাঠ থেকে সবজি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। আর এই বিষাক্ত সবজি খেয়ে সাধারণ মানুষ নানা ধরনের অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়। কৃষি ইউনিটের আওতায় গত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদেরকে তাদের জমিতে কীটনাশক ব্যবহার না করে এর পরিবর্তে এখন সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা এই এলাকার মানুষের নিকট জাদুর ফাঁদ বলে পরিচিত পেয়েছে।

সবজি বীজ উৎপাদন করে
শফিকুল ইসলামের
পাল্টে গেল ভাগ্যের চাকা

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব। এ কথারই প্রতিধ্বনি করে কৃষিক্ষেত্রে বলা যায়, কৃষককে ভাল বীজ দাও, দেশকে ফসলে ভরে দিবে তারা। আর এই ভাল বীজের যোগান দিতেই অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মেহেরপুরের পরিচিত মুখ শফিকুল ইসলাম।

কৃষক শফিকুল ইসলাম। শাক-সবজি এবং বীজ উৎপাদন করে বছরে আয় করছেন প্রায় ১-১.৫ লক্ষ টাকা। নিজে বদলে যাওয়ার পাশাপাশি আশেপাশের লোকদের পরিবর্তনের আশায় প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন। শফিকুল ইসলাম গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের বাসিন্দা। এক মেয়ে ও এক ছেলে সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়ে বর্তমানে মেহেরপুর সরকারী কলেজে অনার্স পড়ছে এবং ছেলে কলেজে পড়াশুনা করছে। তাদের নিয়ে শফিকুল ইসলাম সুখের সংসার। স্ত্রী বাড়ীর কাজের পাশাপাশি স্বামীকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করছেন। ছোটবেলা থেকেই কৃষিকাজের প্রতি ছিল প্রচন্ড রকম দুর্বলতা, কারণ তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক। নিজের জমি এবং অন্যের জমি লিজ নিয়ে সবজি চাষ ও বীজ উৎপাদন করছেন। বর্তমানে নিজের ৩ বিঘা এবং অন্যের ৭ বিঘাসহ মোট ১০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষ এবং সবজি বীজের নার্সারী স্থাপন করেছেন শফিকুল। নিজে সদস্য হওয়ার সুবাদে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মানসম্পন্ন সবজি বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য তিনি বাটিশাক চাষ করেন। সংস্থার কারিগরি সহযোগিতায় এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে বাটিশাক চাষ শুরু করেন। এ চাষে তার ব্যয় হয় সর্বসাকুল্যে তিন থেকে চার হাজার টাকা। মোট সবজি বীজ উৎপাদন হয় প্রায় ৭ মণ। প্রতি মণ সবজি বীজ গড়ে ৩৫০০/- হিসাবে ২৪,৫০০/- টাকার সবজি বীজ বিক্রয় করেন। এতে তার এক বিঘা জমি থেকে ৬ মাসে ২১,০০০/- টাকা লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য শাকের বীজের চেয়ে বাটিশাক উৎপাদনে কম পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করা হয় এবং মাড়াই ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সহজ। সার ও কীটনাশক কম লাগার কারণে চাষাবাদ খরচ কম হয়। ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয় না। এ কারণে এলাকার লোকজন বাটি শাকের বীজ উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে এবং লাভবান হচ্ছে।

লাউ চাষে আসাদুলের চমক

এক দশক আগেও ধান, আলু, মরিচ, মুলা, বেগুনসহ প্রচলিত মৌসুমি ফসলের চাষাবাদে সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কৃষিকাজ। কিন্তু এখন দিন বদলে গেছে। সেই চাষিরাই এখন বছরব্যাপী আবাদ করছে নানা সবজি। চাষিরা জানিয়েছেন, অন্যান্য ফসলের চেয়ে অমৌসুমে সবজি চাষে লাভ অনেক বেশি হয়। আসাদুলের ১ ছেলে, ১ মেয়ে,বাবা-মা নিয়ে মোট ৬ জনের সংসার।

আসাদুলকে তার স্ত্রী পরিবারের কাজের পাশাপাশি কৃষিকাজে সহায়তা করেন। আসাদুলের মা তিন বছর ধরে পলাশীপাড়ার সমাজ কল্যাণ সমিতির সদস্য। কৃষিকাজের জন্য চাষের উপর ৩০,০০০/- টাকা ঋণ নেয় তাঁর মা। আসাদুলের মা জানতে পারে, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী এবং কৃষিকাজে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এর আলোকে নিরাপদ সবজি চাষ প্রদর্শনী স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করে আসাদুলের মা। স্বশিক্ষিত আসাদুলের ছোটবেলা থেকেই চাষাবাদের প্রতি ছিলো আগ্রহ। কিভাবে কীটনাশক ব্যবহার কম করে এবং কেঁচো সার ব্যবহার করে লাউ চাষ করা যায় তার জন্য পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সাথে যোগাযোগ করেন আসাদুল।

একদিন বাড়ীর পাশের কৃষকের কাছে জানতে পারে যশোরে চিরা/হাজারী লাউ এর বীজ পাওয়া যায়। সেখান থেকে বীজ সংগ্রহ করে আসাদুল ১.৫ বিঘায় অমৌসুমের চিরা/হাজারী জাতের লাউ চাষ করা শুরু করেন। চাষ করার সময় আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কৃষক আসাদুল প্রয়োজন মাফিক জৈব সার ব্যবহার করছেন। এছাড়াও লাউ এর ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে গাছের গোড়ায় লাউ সংগ্রহের পর ২৫০-৩০০ গ্রাম করে কেঁচো সার প্রদান করেন।

চিরা লাউ এর বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি গিটে গিটে লাউ ধরে। এক গাছ থেকে ৪ মাসে ৭০-৭৫টি লাউ পাওয়া যায়। এছাড়া বিষমুক্ত সবজি চাষের জন্য ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করে থাকে। ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করার ফলে মাছি পোকার আক্রমণ রোধ করা যাচ্ছে বলে কীটনাশক এর ব্যবহার কম হচ্ছে। আবার প্রচুর পরিমাণে জৈব সার এবং কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করতে হয়েছে। কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন ফল বেশী ধরছে এবং স্বাদেও ভাল হওয়ায় বাজারে চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

বর্তমানে ৩ দিন পরপর ৩০০-৪৫০টি লাউ আহরণ করছেন আসাদুল যার বাজার মূল্য প্রায় ৬,০০০-৭,৫০০ টাকা। তিনি মাসে প্রায় ৩০,০০০/- থেকে ৩২,০০০/- টাকার লাউ বিক্রি করে প্রায় ৫ মাসে ১.৫ বিঘা জমি থেকে খরচ বাদে ৭০,০০০/- থেকে ৭৫,০০০/- টাকা লাভ করেছেন। লাউ চাষে আসাদুলের সাফল্যে এলাকার লোকজন এখন আসাদুলের কাছে আসছেন এবং পরামর্শ নিচ্ছেন। তার এ সাফল্য এলাকায় তরুণ কৃষকদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা।

মৎস্য ইউনিট

পৃষ্ঠা ঃ ২০-৩৫

মাছ চাষে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে স্বাবলম্বী

মজনু হোসেন

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় ষোলটাকা অঞ্চলের কাষ্টদহ গ্রামের বাসিন্দা মো: মজনু হোসন। পিতা আবু বক্কর ছিলেন একজন আপাদমস্তক কৃষক। কিন্তু তৎকালীন সময়ে আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার মত জনসচে-তনতামূলক কর্মসূচীসমূহ না থাকায় পিতা আবু বক্কর তার সংসারকে পরিকল্পনাহীন অনেক বড় করে ফেলেন। তার পরিবারে ছেলে মেয়ে নিয়ে ৬ সদস্যের সংসার গড়ে উঠে। মজনু হোসেন পিতা মো: আবু বক্করের তৃতীয় সন্তান। বৃহৎ পরিবারের অন্ন জোগাড় করতে আবু বক্কর রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন।

পিতার এই বেহাল অবস্থা দেখে তার তৃতীয় সন্তান সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি তাদের পতিত পুকুরকে কাজে লাগিয়ে কিছু একটা করবেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি গ্রামের বাড়ী থেকে উপজেলায় চলে যান। ২০০০-২০০১ সালের দিকে গাংনী উপজেলা হতে মাছের উপর তিনি স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে তার পুকুরে ছেড়ে দেন। কিন্তু তার দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞান লাভের অভাবে উক্ত প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আগস্ট মাসে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এর মৎস্য কর্মকর্তার বলিষ্ঠ পরামর্শে তিনি তার পুকুরকে রৌদ্রোজ্জ্বল করে তুলে আগাছা মুক্ত করেন ।

একই সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। পিএসকেএস এর মৎস্য কর্মকর্তার বিরামহীন প্রচেষ্টা ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের ফলে একসময় মোঃ মজনু হোসেন তার পুকুরে ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ প্রযুক্তি গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে মজনু হোসেন তার পুকুর দিয়ে অর্থনৈতিক অভিশাপ হতে মুক্তির পথ খুঁজে পান।

বর্তমানে মোঃ মজনু হোসেন প্রায় ৬০ শতাংশ করে ২ টি আলাদা পুকুরে ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ করে বছরে প্রায় কমপক্ষে ১-১.৫ লক্ষ টাকা আয় করছেন। সব মিলিয়ে মজনু হেসেনের ৩ টি বড় পুকুর রয়েছে। পরিবারের অতীত দুঃখ-কষ্ট যেন এক ছায়া পথিক হিসাবে তিরোহিত হয় এটাই সকলের কাম্য। বর্তমানে মজনু হোসেনের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। সময়ের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণকারী মজনু হোসেনের ন্যায় ব্যক্তিরা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুক এটাই আমাদের সর্বস্তরের জনসাধারণের ঐকান্তিক কাম্য।

কার্প ফ্যাটেনিং করে খায়রুল ইসলাম এর ভাগ্য পরিবর্তন

মোঃ খায়রুল ইসলাম গাংনী উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ষোলটাকা ইউনিয়নের এক উদ্যোগী ও পরিশ্রমী মৎস্য উদ্যোক্তা। অল্প বয়সে বিয়ে করে মনোযোগী হয় চাষাবাদে। কিন্তু ধান চাষে খুব বেশি লাভবান হতে না পারায় বাড়ির একটি ৩০ শতকের পুরনো পুকুর নিয়ে মাছ চাষ শুরু করে ২০১২ সালে। তখন থেকে মাছ চাষের পাশাপাশি ৩ একর জমিতে ধান চাষ করতেন। তখনো জানতেন না যে, পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি সবজি চাষ করেও লাভবান হওয়া যায়। ২০১৩ সালের শেষের দিকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি থেকে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করে খায়রুল ইসলাম।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় পিএসকেএস তাকে কার্প ফ্যাটেনিং বা কার্প মাছ মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করে এবং পুকুর পাড়ের পতিত জমিতে সারাবছর মৌসুমী বিভিন্ন সবজি চাষের পরামর্শ প্রদান করে। সেই বছরে ৩০ শতক পুকুরে দেশীয় প্রজাতির শিং মাছ চাষ করে ৪০,০০০ টাকা লাভের পাশাপাশি পুকুর পাড়ের ৭ শতক জমিতে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শশা, পেঁয়াজ, রসুন, গাজর ও পেঁপে চাষ করে। এগুলো চাষ করে সে ৫০০০/- টাকার সবজি বিক্রি সহ সারাবছর বাড়ির সবজির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এই চিন্তা মাথায় রেখে, ২০১৭ সালে তার ৩ একর ধানের জমি কেটে পুকুর খনন করে এবং শুরু করে মাছ এবং পুকুরের পাড়ে সবজি চাষ। তার পুকুর দেখে মনে হয় এ যেন পুকুর নয়, একটি সবজি বাগান। ২০১২ সালে ২টি পুকুর দিয়ে মাছ শুরু করলেও বর্তমানে ছোট বড় মিলে মোট ৪ টি পুকুরে শিং-মাগুর মাছের মিশ্র চাষ, পাঙ্গাস ও মনোসেক্স তেলাপিয়া, কার্প মাছ মোটাতাজাকরণ করছেন। বিগত বছরে মাছ চাষে লাভ করেছেন প্রায় ২.৫-৩.০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তার পুকুর পাড়ে ২০০টি পেঁপে গাছ, ২০টি কাগজি লেবুর গাছ, কলা গাছ ২০টি এবং পুকুরের প্রশস্ত পাড়ে চাষ করছেন কাঁচা মরিচ, বেগুন, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, পুইশাক, পালংশাক, লাল শাক, চালকুমড়া, করলা, শশা। গত বছর তিনি ৬০ মণ পেঁপে, ১৭ মণ ঢেঁড়স, ১৫০টি চালকুমড়া, ১০০টি লাউ, ৩০ মণ কাঁচা মরিচ, ৪০ মণ মিষ্টি কুমড়া সহ অনেক শাক-সবজি বিক্রি করেন যার মুল্য প্রায় ১,৫০,০০০/- টাকার মতো। এই সফল চাষীর কার্প মাছ মোটাতাজাকরণ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষের সফলতা দেখে গ্রামের অনেকেই শুরু করেছে এ পদ্ধতি। শুধু এই গ্রামের মানুষ নয় অন্য গ্রাম থেকেও অনেকে দেখতে আসেন এই খামার। এ যেন এক আদর্শ সমন্বিত মৎস্য খামার। বর্তমানে তার পুকুর নিয়ে আরও অনেক পরিকল্পনা আছে-লাগানো হবে আরও সবজি। তার মতে, তিনি পুকুর পাড়ের এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখবেন না। মৎস্য ইউনিটের সঠিক দিকনির্দেশনা ও তাঁর ইচ্ছাশক্তি যে একটি যুবকের জীবন কতটা পাল্টে দিতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ এই উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও একাগ্রচিত্ত যুবক মোঃ খায়রুল ইসলাম।

নাজেরা খাতুনের সাফল্যের নেপথ্যে

দরিদ্র সদস্য নাজেরা খাতুনের এক ছেলে। ছেলে লেখাপড়ার পাশাপাশি মায়ের সাথে অন্যের ঘরে দিন মজুর করে সংসার চালায়। তার বাড়ির পাশের ৪৫ শতক পুকুর এবং উঠানে ১০ শতক জমি আছে যেখানে তিনি ধান চাষ করেন। নাজেরা খাতুন ও তার ছেলের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং পুকুরের সম্পূর্ণ পাড়ের সবজি চাষ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। তার পুকুরটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় শিং-মাগুর কার্প মিশ্র চাষ ক্যাটাগরিতে নির্বাচন করা হয়। তিনি প্রকল্প প্রদত্ত সহায়তা হিসেবে মাছ, খেপলা জাল, সার, চুন, পেঁপে, লাউ ও টমেটোর চারা সহ মোট ১৩ রকমের সবজি বীজ পান। তিনি তার পুকুরে ৮০০ পিস শিং, ২০৮ পিস মাগুর এর পোনা সহ ১০০ পিচ রুই, ৭০ পিচ কাতল, ৫০ পিচ সিলভার কার্প ও ১৫ পিচ গ্রাস কার্প মজুদ করেন।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শমতো তার পুকুরে চুনও সার প্রয়োগ করেন এবং বামুন্দি শাখা হতে ২৫,০০০/- টাকা মৎস্য খাতে ঋণ গ্রহণ করে মাছের খাবারের যোগান দেন। সঠিক এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার ফলে তার মাছের বৃদ্ধি খুব ভালো হয়।

মাছ চাষে তার আয় ও ব্যয়ের হিসাবঃ

ব্যয়ের হিসাব ঃ
মাছের পোনা ক্রয় - ৬৭০০ টাকা
খাবার বাবদ - ৮৪০০ টাকা
পুকুর প্রস্তুতি - ১২০০টাকা
মোট ব্যয় - ১৬,৩০০ টাকা

আয়ের হিসাব ঃ
শিং ৫২ কেজি x ৩৫০= ১৮,২০০ টাকা
মাগুর ২৫ কেজি x ৪৫০=১১,২৫০ টাকা
রুই মাছ ৪১ কেজি x ১৪০= ৫,৭৪০ টাকা
কাতলা মাছ ৩৭ কেজি x ১৩০= ৪,৮১০ টাকা
সিলভার কার্প ৩৫ কেজি x ১০০= ৩,৫০০ টাকা
গ্রাস কার্প ১১ কেজি x ১২০= ১,৩২০ টাকা

মোট মাছ বিক্রি = ৪৪,৮২০ টাকা
মাছ চাষে তার লাভ হয় ২৮,৫২০ টাকা
তার পুকুরে এখনও প্রায় ১৯,৫০০ টাকা মূল্যের শিং-মাগুর ও কার্প জাতীয় মাছ আছে।

সফল খামারী
তাসলিমা খাতুন

সভ্যতার শুরুতে মানুষ তার ভাগ্য উন্নয়নে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তার একটি বাস্তব উদাহরণ মোছাঃ তাসলিমা খাতুন। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোল টাকা ইউনিয়নের ষোলটাকা গ্রামের বাসিন্দা। জীবনের পথ চলাটা সহজ ছিল না তাসলিমার। প্রথম দিকে মানুষের বাড়ীতে থেকে শুধু পেটে ভাতে ঝিয়ের কাজ করত। তাসলিমার দুই মেয়ে। স্বামীর সংসারে তাদের কষ্টের সীমা ছিল না। শত প্রতিকূলতার মধ্যে কখনো থেমে থাকেনি তার পথচলা। তার স্বামী মাছের ব্যবসা করে, সবার যেমন কিছুনা কিছু শখ থাকে তেমনি তাসলিমা খাতুন এর শখ ছিল মাছ চাষ করা। তাই সে তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সদস্য হয়ে ২০১৬ সালে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি পুকুর লীজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করে। পুকুরে প্রথমে কার্প জাতীয় মাছের সাথে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করে এতে বছরে মূলধনের তুলনায় ৩০ হাজার টাকা লাভ করে তাসলিমা। এভাবে ২০১৭ সালে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি থেকে আরো ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২ বিঘা পুকুর লীজ নেয় এবং পিএসকেএস থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য প্রশিক্ষণ সহ পোনা নার্সারার প্রদর্শনী পেয়ে থাকে। ২০১৭ সালে রুই, কাতলা, সিলভার, গ্রাসকার্প, সরপুটি, বাটা মাছের ধানী পোনা কিনে একটু বড় করে এলাকার অন্য চাষীদের কাছে বিক্রি শুরু করে। ২০১৭ সালের শেষ দিকে সব মিলিয়ে ১,২৫,০০০/- টাকা লাভ করে। ২০১৮ সালে পলাশীপাড়ার মৎস্য অফিসারের পরামর্শক্রমে তার লীজ সহ মোট ২টি পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের পোনা চাষ শুরু করেন।

আধুনিক পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের ডিম পুকুরে ফোটায় ফলে শুরু থেকেই পুকুর হতে লাভের মুখ দেখতে পান। সময়ের সাথে সাথে তাসলিমা খাতুন ভাগ্যের পালা বদল শুরু হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলেই পোনা মাছের ব্যবসা করতে থাকে। তাসলিমা খাতুন এখন আরও ২টি পুকুর লিজ নিয়ে গড়ে প্রতি বছর ১.৫০ লক্ষ হতে ১.৯০ লক্ষ টাকা মাছের পোনা হতে আয় করে থাকেন। এলাকার অন্যান্য মাছ চাষীরা যেন মাছ চাষের এক নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছেন তাসলিমা খাতুন এর পুকুরের লাভ দিয়েই তার সংসার চলাসহ দুই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ, পুকুর লীজ নেওয়া সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় মিটাতে সক্ষম হচ্ছেন। বর্তমানে তারা পোনা মাছ বিক্রির পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বড় মাছ ক্রয় বিক্রয় করে। এরূপ দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন মানুষেরা উত্তর উত্তর উন্নত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাক এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

নজরুল মাস্টার
এর দিনবদলের গল্প

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ এবং জনসংখ্যার বেশি হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের অভাব হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার বেশি হওয়ার কারণে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারী সংস্থা সমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তেমনি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তাদের সহযোগী সংস্থার সদস্যদের আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে। তেমনি একটি প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট।

এই প্রকল্পের মৎস্য ইউনিটে সদস্যদের পুকুর সংস্কার করণের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে পুকুরে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ করে সদস্যর আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অধিক মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তেমনি এক সদস্যের গৌরব গাঁথা সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরা হলো। নজরুল ইসলাম মাস্টার, গ্রাম-কাষ্টদহ, ইউনিয়ন-ষোলটাকা, ডাকঘর-জুগিরগোফা থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর। ছোট বেলা থেকেই মাছ ধরার ও খাওয়ার প্রবল নেশা। বর্ষা আসলেই তার আনন্দের বন্যার অবসান ঘটে। তার চিন্তা হয় কিভাবে মাছ চাষ করা যায়। সেই সময় তার এলাকায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি কর্তৃক মৎস্য ইউনিট প্রকল্পের আওতায় সদস্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনুদানের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছিল। এই খবর সে তার এলাকার লোকদের কাছে শুনতে পারে। তারপর সে সেই সমিতির মৎস্য অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে। পরে সে মৎস্য ইউনিটের পুকুরে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণে যোগদান করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সে তার ০৫টি পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ করার উপযোগী করে গড়ে তোলে। সেখানে তাকে অনুদান হিসেবে ২০৮ পিস মাগুর মাছের ও ১০০০ পিস শিং মাছের পোনার সাথে আরো কার্প জাতীয় মাছের উন্নতমানের পোনা পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর সে সংস্থার শাখা হতে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ০৫টি পুকুরে আরো শিং-মাগুরের পোনা ও খাবার কেনে।

প্রতিদিন সে সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে কখন কি দিতে হবে কতটুকু মাছের খাবার দিতে হবে, পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে কিনা লবণ দিতে হবে কিনা ইত্যাদি এভাবে সে আট মাস মাছের যত্ন নেয়। ৮ মাস পর তার শিং ও মাগুর মাছের পুকুর সেচে ফলে এবং মাছ সংগ্রহ করে। যা বিক্রি করে সে ৩৩০,০০০/- টাকা পায়। সেখানে তার খরচ হয় মাত্র ১২০,০০০/- টাকা মাত্র। এখন সে চিন্তা করছে গ্রামের আরো পুকুর লিজ নিয়ে শিং মাগুর কার্প মাছ চাষ করবে। গ্রামের সবাই তাকে মাছ ব্যবসায়ী বলে সম্বোধন করে।

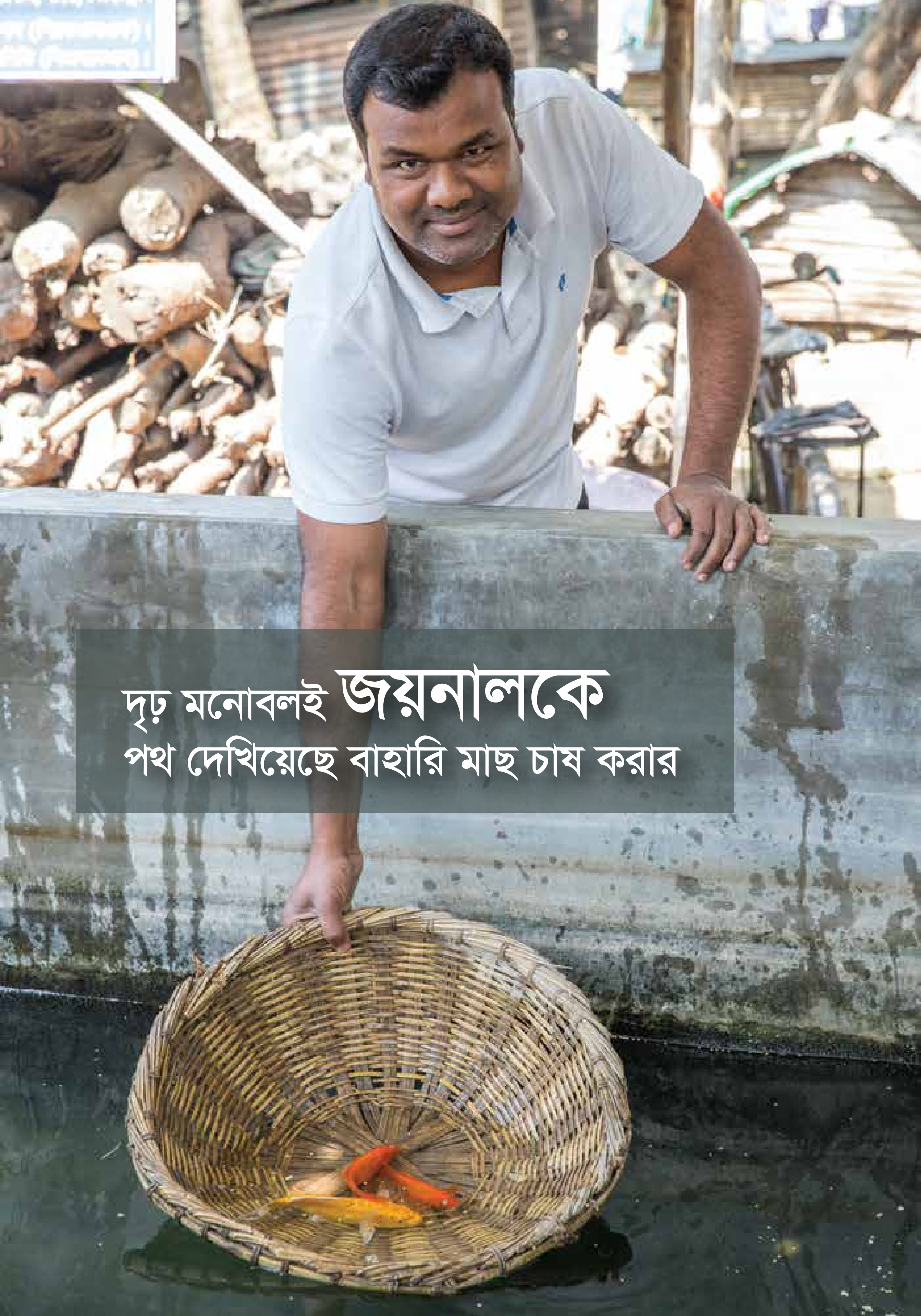

দৃঢ় মনোবলই জয়নালকে পথ দেখিয়েছে বাহারি মাছ চাষ করার

স্বাধীনতা উত্তর সাহারবাটি গ্রামের বাসিন্দা মোঃ জয়নাল আবেদীন। পরিবারের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকে। যখন জয়নাল এর পরিবার প্রচন্ড আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়, তখন সাম্প্রদায়িকতারও একটি প্রচ্ছন্ন অপশক্তি এই নিরীহ সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানে। মা বাবা আর সন্তান নিয়ে জয়নাল এর সংসার যেন এক অতল গহবরে নিপাতিত হওয়ার উপক্রম। উপায়ন্তর না দেখে জয়নাল তার বাড়ীর পাশে ছোট পুকুরটিকে সম্বল করে স্বপ্নের জাল বুনন বুনতে থাকে। প্রথম দফায় তৎকালীন সময়ে কুষ্টিয়ার জেলার

মজমপুর অঞ্চল হতে কিছু বিভিন্ন জাতের পোনা মাছ ক্রয় করে এনে তার পুকুরে ছেড়ে দেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে তিনি প্রথম বছর লাভের মুখ হতে বঞ্চিত হন। এরপরও তিনি থেমে থাকেননি তার বাড়ীর পার্শ্বে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সাহায্যে পুনরায় জাগিয়ে তোলে মনের গহীন আগ্রহ কে। ২০১৬ সালে পিএসকেএস থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তার ছোট্ট পুকুরে বাহারি মাছ চাষ শুরু করে।

বাহারি মাছ চাষে জয়নাল এর সাহসকে পুরোটাই কাজে লাগাতে পুকুরের পাশাপাশি চৌবাচ্চায় চাষ করার জন্য পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ১৫,০০০/- টাকার প্রদর্শনী পেয়ে থাকে সেই সাথে প্রশিক্ষণ ও পেয়ে থাকে। গোল্ড ফিশ, কমেট, কৈ কার্প, কিচিং গোরামি সহ নানাবিধ মাছের প্রজনন শেখানো হয়। এই অভিজ্ঞতা তার জীবনকে পাল্টে দিতে শুরু করে। এলাকায় জয়নাল এখন বাহারি মাছ চাষী নামে পরিচিত।

বাহারি মাছের চাষ এর পাশাপাশি এর এ্যাকুরিয়াম তৈরীর বিষয়ে ধারণা নেয় মৎস্য কর্মকর্তার কাছে। এভাবে তার বাহারি মাছের উপর চাষের দক্ষতা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে সে সফল বাহারি মাছ চাষীতে পরিণত হয়। মেহেরপুরের মানুষ কুষ্টিয়া বা ঢাকার পরিবর্তে জয়নালের কাছে বাহারি মাছের পোনা সংগ্রহ করছে। জয়নাল তার বাহারি মাছ চাষের পাশাপাশি সাহারবাটি চারচারা বাজারে একটি ওষুধের দোকান দিয়েছে তার লক্ষ্য হলো দোকানে ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি বাহারি মাছ ও এ্যাকুরিয়াম বিক্রি করা যা তার আর্থিক অবস্থাকে আরো স্বাবলম্বি করে তুলবে। তাঁর পুকুরে এখন পুকুরে ১.০ লক্ষ টাকা মূল্যের বাহারি মাছ আছে।

কুচিয়া চাষে সফল
মাসুদ রানা

জ্ঞানের আলোয়, শক্তি সামর্থ্যের চেয়ে বড় জিনিসকে সে বসে আনতে পেরেছে। প্রতিনিয়ত তার জানার পরিমাণ ও পরিধি বাড়ছে। অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ হল- অল্প জায়গায় স্বল্প পরিমাণ টাকা ব্যয় করে যে মাছ চাষ করে সারা বছর আয় করা যায় তার মধ্যে কুচিয়া মাছ অন্যতম। অনেক স্বপ্ন ছিল ভাল কিছু করবে কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের কারনে সম্ভব হয়নি। তবুও সে থেমে যায়নি। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের সাহারবাটি গ্রামের মাসুদ রানার।

মাসুদ রানা পেশায় কাঠ মিস্ত্রি। অল্প বয়সে লেখাপড়া শেষ না করেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল। তাই ছোট থেকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। সাহারবাটি এলাকায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ১২টি ডিচের ১টি কুচিয়ার ক্লাস্টার করা হয়। এই ক্লাস্টারে মাসুদ রানা নিয়মিত যাতায়াত করতো এবং তাদের সাথে আলোচনা করত। প্রায় প্রতিনিয়তই পিএসকেএস-এর মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতো। অবশেষে কুচিয়া প্রদর্শনী পেয়ে সে খুবই খুশী ছিল। কুচিয়ার ডিচ পেয়ে সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে। কুচিয়া চাষের জন্য ২৪ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১২ ফুট প্রস্থ ডিচ তৈরী করে দেয়। কুচিয়া ডিচ তৈরী বাবদ মোট ১৭,০০০/- টাকা ব্যয় হয় যার মধ্যে মৎস্য ইউনিটের মাধ্যমে ১৩,০০০/- টাকা সদস্য পায় এবং বাকি ৪,০০০/- টাকা সে নিজে বহন করে।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ১৬ কেজি কুচিয়া এবং ১১ কেজি দেশি তেলাপিয়া মাছ সহ আরো অন্যান্য উপকরণ পেয়েছে। প্রায় ৪ মাস কুচিয়া লালন পালন করার পর কুচিয়া পোনা ছাড়ছে। এ যাবৎ প্রায় ২০০ টি কুচিয়ার পোনা সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে মাসুদ রানার খামারে প্রায় ২৫০টি কুচিয়া মা মাছ আছে যার প্রতিটির ওজন প্রায় ৪৫০-৬৫০ গ্রাম। বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি মা কুচিয়া প্রায় ৩০০/- টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সে হিসেবে ২৫০ টি কুচিয়া ৩৫,০০০/- বিক্রি করা যাবে। এছাড়া প্রতিটি বাচ্চা (১০০ গ্রাম) ৩০-৩৫ টাকা করে বিক্রি করা যাবে যা থেকে প্রায় ৮-৯ হাজার টাকা আয় হবে। মোট ৫ মাস লালন পালন করে প্রায় ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় হবে বলে মাসুদ রানা আশাবাদী। নতুন করে আর একটি ডিচ তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে সে। কুচিয়ার খাবার হিসেবে কেঁচো দেওয়া সহ সকল কাজ তার ছেলে করে থাকে। তার এ সাফল্য দেখে গ্রামের অনেক মানুষ কুচিয়া চাষে আগ্রহী হচ্ছে। তার ইচ্ছা কাঠমিস্ত্রিও কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয় হিসেবে কুচিয়ার চাষ করা। কারণ এত খরচ কম লাগে, জায়গা কম লাগে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

(প্রাণিসম্পদ খাত)

পৃষ্ঠা ঃ ৩৬-৪৭

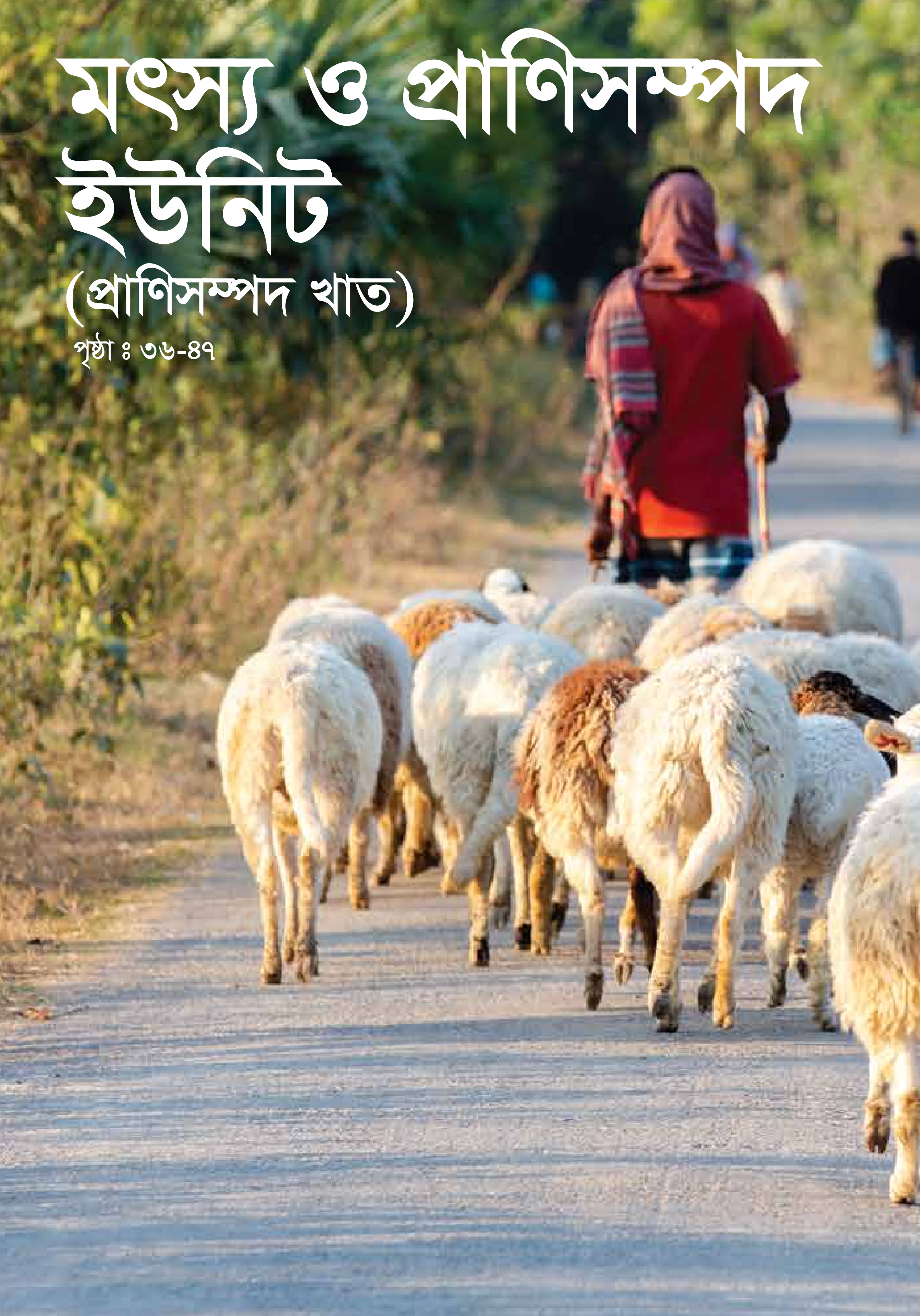

রেবেকা বেগমের
সংগ্রামী জীবন

মোছাঃ রেবেকা বেগম, সাহারবাটি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ। স্বামী কৃষক, সন্তানদের নিয়ে সামান্য পরিমাণ আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খান। রেবেকা বেগম ভালই বুঝতে পারেন সংসারে স্বামীর পাশাপাশি বাড়তি আয়ের প্রয়োজন। সংসারের জন্য কিছু করার প্রবল ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে।

ভর্তি হন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর রক্ত জবা মহিলা দলে। প্রথম পর্যায়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং নিজে কিছু টাকা দিয়ে একটা গাভী ক্রয় করেন। সে বছরেই গাভীটা একটা বাচ্চা দেয় এবং দৈনিক প্রায় ৫-৬ লিটার করে দুধ পান গাভী থেকে। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে তিনি প্রতিদিন ৪-৫ লিটার করে দুধ বাজারে বিক্রি করেন। প্রথম বছরে তিনি দুধ বিক্রি করে প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আয় করেন। একদিন সমিতির দলে গাভী পালনের প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এবং আরো কয়েকটি গাভী পালনে তার আগ্রহের কথা পিএসকেএস-এর কর্মকর্তাদের জানান। অতঃপর পিএসকেএস এর প্রাণিসম্পদ কমর্কর্তার পরামর্শে তিনি গরুর থাকার জায়গা মেরামত করেন এবং ডে-সেল্টার তৈরি করেন। কিভাবে গাভীর যত্ন নিলে বেশি দুধ ও স্বাস্থ্যবান বাছুর পাওয়া যায় সে ব্যাপারে পিএসকেএস এর প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন রেবেকা। প্রশিক্ষণের পর রেবেকাকে জীবাণুনাশক ও কিছু ঔষধ সরবরাহ করা হয়। সংস্থার পরামর্শে উত্তম ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করার কারণে তার গাভী এখন ৮-১০ লিটার পর্যন্ত দুধ প্রদান করছে। শুধু দুধ বিক্রয়ে এখন তার বাৎসরিক আয় প্রায় ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা। পাশাপাশি এ পর্যন্ত সে বাছুর বিক্রি করে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আয় করেছেন। বর্তমানে তার একটি গাভী ও ৩টি বাছুর রয়েছে। এখন তিনি সফল গাভী পালনকারী হিসাবে সমাদৃত।

গাভী পালনে আনজিরা বেগমের সফলতা

মোছাঃ আনজিরা বেগম, পেশায় গৃহিনী, স্বামী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে তার বসবাস। স্বামী, সন্তান নিয়ে দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। স্বামীর সামান্য আয়ে তিন বেলা সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেওয়াটাই অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়ে তার কাছে। কিভাবে সংসারের অভাব দূর করবেন সেটা নিয়ে চিন্তায় দিশেহারা আনজিরা।

ঠিক তখনি ভর্তি হন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর রক্তজবা দলে। প্রথমে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং স্বামীকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করেন। আগে থেকেই তার বাড়িতে একটি গাভী ছিল, আমরা জানতে পারি তার গাভীটি দৈনিক প্রায় ৩-৩.৫ লিটার করে দুধ দেয়। গাভী দেখার পরে আমরা বুঝতে পারি সঠিক পরিচর্যা নিলে এই গাভীর দুধ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আমরা তাকে আমাদের গাভী পালন প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করি। তার আগ্রহ দেখে আমরা তাকে আমাদের প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসি এবং গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করি। গাভীর রোগ ও পুষ্টির বিষয়ে বিশদভাবে তাকে অবহিত করি। গাভীর টিকাসহ আমরা তাকে ঔষধ ও কৃমিনাশক প্রদান করি। আমাদের কথা অনুসারে তিনি গাভীর থাকার জায়গা মেরামত করেন এবং ডে-সেল্টার তৈরি করেন। আগে তিনি দুধ বিক্রি করে প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা আয় করতেন। আমাদের প্রকল্পের আওতায় আসার পর থেকে তার গাভী প্রতিদিন ৬-৭ লিটার করে দুধ দিচ্ছে। গত বছরে সে প্রায় ৬৫,০০০/- (পঁয়ষট্টি হাজার) টাকার দুধ বিক্রয় করেছেন। পাশাপাশি এবার কুরবানীর ঈদে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা একটা বাছুর বিক্রি করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। বর্তমানে গাভীসহ তার ৩টি গরু রয়েছে। তিনি এখন আর্থিকভাবে আগের চেয়ে বেশ স্বাবলম্বী হয়েছেন। সামান্য সহায়তা তাকে সাহস যুগিয়েছে সামনে পথ চলার।

ছাগল পালনে লাইলীর দুঃখের অবসান

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের লাইলী খাতুন পেশায় একজন গৃহিনী, স্বামী সন্তান নিয়ে তার অভাবের সংসার। স্বামী অন্যের কৃষি ক্ষেতে কামলা দিয়ে ও বাঁশের ব্যবসা করে সংসারের খরচ চালাতে হিমশিম খান। তিনি ২০১৭ সালের শেষের দিকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর মাধবীলতা দলের অধীনে ভর্তি হন আর আমাদের ছাগল পালনের প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন।

তার বাসাতে আগে থেকেই ৪টি মা ছাগল ও ৩টা বাচ্চা ছিল। তিনি আমাদের কাছে তার ছাগল পালনের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। আমরা সরেজমিনে তার বাসা পরিদর্শন করি এবং তাকে আমাদের প্রকল্পের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নেই। তারই ধারাবাহিকতায়, ২৫/১২/২০১৮ তারিখে আমরা তাকে মাঁচায় ছাগল পালন প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করি। তাকে আমরা ছাগলের মাঁচা ও কৃমিনাশকসহ কিছু ঔষধ সরবরাহ করি। কিভাবে ছাগলের পরিচর্যা করতে হবে এবং রোগ থেকে নিরাপদে রাখতে হবে তার উপরে তাকে আমরা প্রশিক্ষণ দেই। সর্বপ্রথম তিনি আমাদের সমিতি থেকে ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং আরও ৩টা মা ছাগল ক্রয় করেন এবং পালন শুরু করেন। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে তার তেমন একটা খরচ হয় না কারণ তার স্বামী নিয়মিত মাঠে ছাগল চরান। প্রথম বছরে তিনি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার ছাগল বিক্রি করেন। বর্তমানে তার ছাগলের সংখ্যা ১৫টি, এবারের কুরবানির ঈদে সে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকার ছাগল বিক্রি করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। এখন তার সংসারে অভাব নাই, সুখে স্বাচ্ছন্দে স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন।

পাঁঠা পালনে রওশানারা খাতুনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

জুগিরগোফা গ্রামের রওশানারা খাতুন, অভাবের সংসার। স্বামী দিনমজুর, সামান্য পরিমাণ আয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালানো তার কাছে যেন এক চ্যালেঞ্জ। রওশানারা খাতুন দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেও তার মাঝে আত্ম-প্রত্যয়ের কোন কমতি নেই। স্বামীর স্বল্প আয়ে যে তাদের তিন বেলা বাচ্চাদের মুখে আহার তুলে দেওয়া যে অনেক কষ্টসাধ্য তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারেন। স্বামীর সাথে সাথে নিজেও কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৬ সালের প্রথম দিকে ভর্তি হন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর কামিনী দলে।

সর্বপ্রথম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে মা ছাগল কিনেন ২টা এবং পালন শুরু করেন। দলে কর্মীর কাছ থেকে একদিন আমাদের পাঁঠা পালনের প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আমাদের সাথে কথা বলেন। আমরা তাকে পাঁঠা পালনের উপকারিতা ও আয় সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি আমাদের কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজ থেকে দুইটা পাঁঠা ক্রয় করেন। বিগত ১২/০৫/২০১৬ তারিখে আমরা তাকে পাঁঠা পালনের প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসি এবং তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করি। সাথে সাথে আমরা তাকে আরো ২টা পাঁঠা ও জীবাণুনাশকসহ কিছু ঔষধ প্রদান করি। পাঁঠা দিয়ে অন্যের ছাগল প্রজনন করিয়ে সে এখন বছরে প্রায় ৩৫,০০০/- (পয়ত্রিশ হাজার) টাকা আয় করছেন এবং পাঁঠা বিক্রি করে বছরে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা আয় করছে। বর্তমানে তার ৪টি পাঁঠা, ৩টি মা ছাগল ও ৪টি বাচ্চা রয়েছে। এই বছরে সে ১০০,০০০/- টাকা আয় করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি এখন স্বাবলম্বী এবং এলাকার সবার কাছে অনুকরণীয়।

কেঁচো সার উৎপাদন করে এনামুলের ভাগ্য পরিবর্তন

স্ত্রী এবং বাবাকে নিয়ে কেঁচো পরিচর্যায় ব্যস্ত এনামুল। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের এই কৃষক কেঁচো চাষের মাধ্যমে তৈরি করেছেন কৃষি বান্ধব পরিবেশ। মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে প্রাকৃতিক লাঙল হিসেবে কাজ করে কেঁচো। মাটির জৈব সার তৈরিতেও এর জুড়ি নেই। একটা সময় ছিল, মাটি খুঁড়লেই কেঁচো বের হতো। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এখন জমির উর্বরতা শক্তি যেমন কমেছে, কেঁচোও কমেছে অনেক। এর কুফল ভোগ করছেন কৃষকেরা। এসব কৃষককে কেঁচো সার সরবরাহ করে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে সহায়তা করছেন এনামুল হোসেন। একই সঙ্গে কেঁচো চাষকে তিনি একটি লাভজনক কৃষি বান্ধব ব্যবসায় নিয়ে গেছেন। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সাহাবুদ্দীন আহমেদ বলেন, আদর্শ মাটিতে পাঁচ ভাগ জৈব উপাদান থাকে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মেহেরপুরের মাটিতে এখন জৈব উপাদান আছে মাত্র এক ভাগ। গোবরে চাষ করা এনামুলের কেঁচো-সারে জৈব উপাদান আছে ৩০ ভাগ। আবার এই সারে মাটির আরও ১০ ধরনের উপাদান থাকায় ফসল বাড়ার সঙ্গে এর পুষ্টিমানও বাড়ছে। এ সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা শক্তিও বাড়ছে বহুগুণ।

এনামুল ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। একদিন জানতে পারেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি কেঁচো সার উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তিনি সংস্থায় যোগাযোগ করে এবং প্রথম দিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় ভার্মি কম্পোষ্ট এর প্রদর্শনীর আওতায় ২টা রিং এবং ৩,০০০ কেঁচো নিয়ে ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করে। ১ম দুই মাস পর ৬০ কেজি সার তৈরী করেন এনামুল। ১ম বার কেঁচো সার জমিতে ব্যবহার করার ফলে ভাল ফল পান তিনি। ২য় বার ৬০ কেজি সার বিক্রি করে ৬০০ টাকা আয় করেন। সাহারবাটি গ্রামে সবজি চাষ বেশী হয়। ফলে এখানে জৈব সারের চাহিদা বেশী বলে কেঁচো সারের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। যেহেতু দুইটি রিং-এ যে পরিমাণ সার হয় তা চাহিদার তুলনায় খুব কম হওয়ার কারণে সংস্থা থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২টি রিং এর পাশাপাশি আরো দুইটি হাউজ তৈরি করেন। বর্তমানে রিংসহ দুইটি হাউজ থেকে প্রতি ৪৫ দিনে প্রায় ৬০০ কেজি সার উৎপাদিত হচ্ছে। এতে প্রায় ১.৫ মাসে ১০ টাকা দরে ৬০০০ টাকার সার বিক্রি করেন এনামুল। কেঁচো সার বিক্রি করে ২০১৭ সাল থেকে এ যাবৎ প্রায় ৯০ হাজার টাকা আয় করেছেন। কেঁচো সার ব্যবহার করে জমিতে বাড়তি ফলন দেখে আশপাশের চাষিরা এ ব্যাপারে উৎসাহী হন। শীতকাল ছাড়া সারা বছরই কেঁচোর বাচ্চা হয়। আর এগুলোর বংশবিস্তারও খুব দ্রুত ঘটে। এ কারণে মাত্র ২বছরে এনামুলের ৩০০০টি কেঁচো বংশবৃদ্ধি করে ৫.০ লক্ষ কেঁচোতে পরিণত হয়েছে, যার দাম এখন কমপক্ষে ১.৫০ লক্ষ টাকা।

উপসংহার

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) মাঠ পর্যায়ে যে নানাবিধ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করছে তার সুফল প্রকৃতপক্ষে ভোগ করছে কর্মএলাকায় কৃষকরা। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট ইতোমধ্যে কর্মএলাকায় যে সাড়া ফেলেছে তা শুধু কৃষকদের উন্নয়নেই ভুমিকা রাখছে না বরং সংস্থার চলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে করেছে আরো বেগবান ও স্থায়িত্বশীল। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থার নিরলস পরিশ্রম কর্মএলাকায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অগ্রযাত্রাকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে লাগসই এ সকল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্মএলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরো ব্যাপকভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে।

জল তরঙ্গের হাসি